পরমানন্দময় ধামের ধন

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের
হরিকথামৃত

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ

পরমানন্দময় ধামের ধন

মেক্সিকোতে বিশাল প্রচার-সঙ্ঘে পরমারাধ্যতম
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী
মহারাজের হরিকথামৃত

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-বিশ্বপ্রচারক জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

বর্ত্তমান-সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

মূলমঠ :

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩০২
ফোন: ৯৭৩২১১৩২৮৫
Web: SCSMathInternational.com
Email: info@scsmathinternational.com

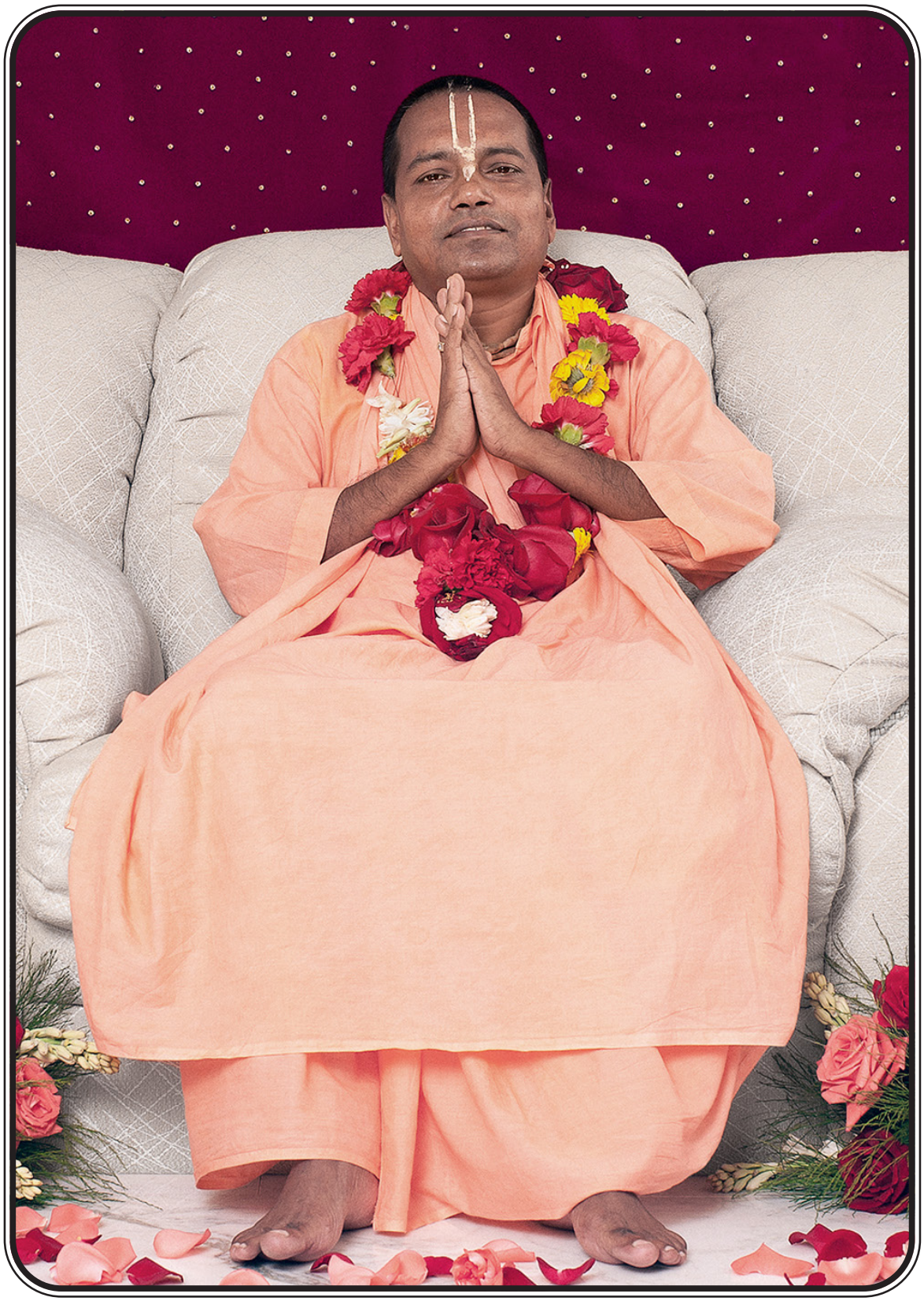

শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীবেদব্যাসের পরম দান

(১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রচারকালে
পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ
দেবগোস্বামী মহারাজের পদ্মমুখের হরিকথামৃত)

আমাদের শ্রীকৃষ্ণানুশীলন সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতম্ হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন এবং উত্তম গ্রন্থ। যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সমস্ত ১৮ পুরাণগুলো রচনা করেছেন, যে সমস্ত বেদগুলো ভাগ করে প্রকাশ করেছেন, সে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচনা করেছিলেন।

তার আগে সমস্ত বেদ একটা প্রচুর গ্রন্থরূপে ছিল, কিন্তু যেহেতু কলিযুগে জীবের স্মৃতি-শক্তি বেশি নয়, সেহেতু তাদের মঙ্গলের জন্য বেদব্যাস সমস্ত বেদগুলো চারভাগে ভাগ করেছিলেন— সেইভাবে প্রকাশ হয়েছিল ঋক্ বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। যদিও তিনি চারগ্রন্থে

বেদকে ভাগ করেছিলেন, তবু প্রত্যেকটি গ্রন্থ বড়-বড় গ্রন্থ হয়ে গিয়েছিল, তাই তারপর বেদব্যাস ভাবলেন, "জীব (বিশেষভাবে মানবরূপে) অনেক আয়ু পায় না—ওরা এই সমস্ত বেদগুলো পড়াশোনা করলেও এই সব গ্রন্থের সার বুঝতে পারবে না।" সেটা ভেবে তিনি সমস্ত বেদের সার নিয়ে বেদান্ত দর্শন (বা বেদান্ত সূত্র) রচনা করেছিলেন। বেদান্ত দর্শন বড় গ্রন্থ নয়, তবু বেদব্যাস ভাবলেন যে, সেটা জীবের বোঝা খুব কঠিন। তারপর তিনি ১৮ প্রকার পুরাণগুলো ও মহাভারত রচনা করেছিলেন (মহাভারত ইহা উচ্চ স্থান পেয়েছে যে, সাধারণভাবে সেটাকে "পঞ্চম বেদ" বলা হয়)।

তাই, বেদব্যাস সমস্ত শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তবুও তিনি হৃদয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সব কিছু শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার দ্বারা সুখী হন নি। "কি হয়েছে?"—তিনি অন্বেষণ করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন,

“আমি এই মায়া-বদ্ধ জীবের প্রতি কিছু মঙ্গল করবার জন্য যত সম্ভব চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি মনে সন্তোষ পাচ্ছি না কেন ?” দুঃখিত হয়ে পড়ে তিনি সেটা ভেবে ভেবে দেখলেন যে, একবার তাঁর গুরুদেব নারদ গোস্বামী বদরিকাশ্রমে এসে গিয়েছেন। গুরুদেবকে দেখে বেদব্যাস তাঁর শ্রীচরণে পড়ে বললেন, “আমি খুব ধন্য যে, আপনি এসেছেন, আমার প্রাণের প্রভু। আমি বুঝতে পারছি না কী হয়েছে আমার। আমি মনে খুশি নই।”

নারদ গোস্বামী বললেন, “হ্যাঁ, আমি সেটা বুঝেছি, তাই আমি তোর কাছে এসেছি।”

সেটা শুনলে বেদব্যাস খুব খুশি হয়ে বুঝিয়ে দিলেন, “প্রভু, কৃপা করে বলুন এবার কী হয়েছে ? আমি সবার প্রতি কি করে মঙ্গল করতে পারি ? আমি ভাবলাম যে, আমি অনেক কিছু করেছি, কিন্তু এত বেশি গ্রন্থ রচনা করলেও আমি কোন সুখ মনে পাচ্ছি না। সেটাই আমার দুঃখ।”

তখন নারদ গোস্বামী তাঁকে কিছু বকা-ঝকা করে বললেন, "হ্যাঁ ! তুমি কি করে সম্পূর্ণ সুখ পাবে ? তুমি ভাবছো যে, তুমি এই জড়-জগতে জীবের জন্য যা দিয়েছো, সেটাই যথেষ্ট, কিন্তু সেটা আসলে যথেষ্ট কি না ? কী ভাবছো তুমি ?"

বেদব্যাস বলেছেন, "আমি অনেক কিছু রচনা করেছি আর তার মধ্যে মায়াবদ্ধজীবের প্রতি অধিকার বা অবস্থা অনুযায়ী উপদেশ দিয়েছি। যার অধিকার ওই রকম যে তাদের কর্ম্মযোগ অনুশীলন করতে হবে, আমি তাদের জন্য উপদেশ দিয়েছি কি করে সেটা অনুশীলন করতে হবে। যার অধিকার ওই রকম যে তাদের কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হবে, আমি তাদের জন্যও উপদেশ দিয়েছি। যার অধিকার ওই রকম যে তাদের জ্ঞান-যোগ অনুশীলন করতে হবে, আমি তাদের জন্যও পদ্ধতি বর্ণনা করেছি। আর যার অধিকার ওই রকম যে তাদের ভক্তি-যোগ অনুশীলন করতে হবে, আমি তাদের জন্যও

উপদেশ দিয়েছি। আমি সব কিছু এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে রেখে দিয়েছি !”

তখন নারদ গোস্বামী বললেন, “আসলে যা তুমি দিয়েছো, সেটা যথেষ্ট নয়। তুমি সব কিছু মিশিয়ে দিয়ে গ্রন্থের মধ্যে পরিবেশন করেছো, কিন্তু তুমি বিশেষভাবে কিছু বল নি। যখন তুমি ভক্তিযোগের কথা বলেছো, তুমি প্রথম ভক্তিযোগের কথা বলেছো কিন্তু তারপর তুমি অন্যান্য উপদেশ দিয়ে ভক্তযোগকে অপমান করেছো। তুমি স্পষ্টভাবে বল নি বদ্ধ-জীব ও মুক্তজীবের প্রকৃত প্রয়োজন কী—মুক্তি পাওয়ার পর জীবের কি প্রয়োজন ? তুমি তাদের মঙ্গলের জন্য কিছু দিতে চেয়েছো, কিন্তু যা আসলে দরকার সেটা তুমি দাও নি। তাহলে তুমি কি করে মনে সন্তুষ্ট হবে ?”

বেদব্যাস বললেন, “কিন্তু আমি ভক্তিযোগ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় দিয়েছি, গরুড় পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, পদ্ম-পুরাণ, মহাভারতেও দিয়েছি।

অনেক শাস্ত্রের মধ্যে আমি ভক্তিযোগকে বর্ণনা করেছি।”

“হ্যাঁ, নিশ্চয় করেছো,” নারদ গোস্বামী তদুত্তরে বললেন, “কিন্তু তুমি সব খাদ্য নিয়ে, সব কিছু মিশিয়ে দিয়ে এই ভাবে পরিবেশন করেছো ! এমন লাবড়া-খিচুড়ি সবার কাছে উপযুক্ত নয় ! আসল কথা হচ্ছে যে, সব কিছু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিবেশন করতে হবে, তখন ওরা বুঝতে পারবে যেরকম স্বাদ খাদ্যের ভিতরে আছে— যেরকম সার আসল ভক্তিযোগের (শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির) ভিতরে আছে। কোথায় তুমি সেটা স্পষ্ট ভাবে বলেছো ? কোথাও নিশ্চয় বলেছো, কিন্তু তারপর তুমি অনেক অন্যান্য জিনিষ বলেছো, তাই ওরা ভুলে গিয়েছে কী তুমি আগে বলে দিয়েছো। এইরকম ভক্তির মহাগুণ মহিমা কীর্ত্তন করলে চলবে না ! সেইজন্য তুমি সন্তুষ্ট নও।”

তখন বেদব্যাস লজ্জা পেয়ে বললেন, “এখন কি করব, প্রভু ?”

নারদ আবার তাঁকে বকা দিয়ে বললেন, "আমি বলছি যে, তুমি মূর্খ ! তুমি জ্ঞানযোগের মহিমা বলতে গিয়ে বলেছো যে, সেটা পরম, কিন্তু তুমি জানো জ্ঞান জীবকে কোন দিকে নিয়ে যায়।"

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

"ব্রহ্ম নিষ্কর্ম্ম তাহার একাকার হেতু নিষ্কর্ম্মতার ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। কামনাময় কর্ম্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি-নিবর্ত্তক হইলেও অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভক্তিবিরহিত হইলে অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধকালে দুঃখরূপ, কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম্য কর্ম্মও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে উহা আবার কি প্রকারে শোভা পায় অর্থাৎ তাহা যে শোভা পায় না তাহা বলা বাহুল্য, কেননা উহা বহির্ম্মুখী ও সত্ত্ব-শোধক ভাবহীন।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১/৫/১২)

"ভক্তি-প্রবৃত্তিরছাড়াচলবেনা—বদ্ধজীবেরও কোন ফল লাভ হবে না, মুক্তজীবেরও কোন ফল লাভ হবে না। তোমায় আবার শুরু করতে হবে। সেটাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ। আবার শূন্য থেকে শুরু করো আর শুধু এক মাত্র গ্রন্থ রচনা করো, এক হাজার গ্রন্থের দরকার নেই— এক গ্রন্থের মধ্যে কেবল পরম-ভক্তি বর্ণনা করো, তাহলে তুমি মনে সন্তোষ পাবে। তাছাড়া, যদি তুমি সেটা দেবে না, তাহলে কে দিবে? সবাই তোমার প্রতি বিশ্বাস করে, তোমার কথার উপর সবাই পরম বিশ্বাস করে, তুমি সবার কাছে সম্মানিত হও, তাই যদি কিছু পরিবর্তন করতে হবে, তুমি মাত্র সেটা করতে পারো, আর কেউ কিছুই পরিবর্তন করতে পারবে না। তোমার কলমকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার নিজেই সেটা পরিবর্তন করতে হবে।"

তাঁর গুরুর কথা শুনে বেদব্যাস একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার মনে হয়

যে, আমি সব কিছু প্রকাশ করেছিই। আমি কী আবার লিখব, সেটা আপনি আমাকে কিছু ইঙ্গিত দেবেন?"

তখন নারদ গোস্বামী তাঁকে চার শ্লোক দিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আর ওই চার শ্লোকের দ্বারা বেদব্যাস সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচনা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচনা করলে তিনি মনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। তারপর তিনি ভাবলেন, "এই জগতে কে সেটা বিস্তার করতে পারবে? সেটা ভগবানের ভক্তি তো—আমি আগে এই জগতে সব কিছু বর্ণনা করেছিলাম, সব সাধন-পদ্ধতি দিয়েছিলাম (জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, ইত্যাদি), তাই যদি আমি এখন কেবল ভক্তি দেব, কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। যদি আমি চাই যেন সেটা বদ্ধজীব ও মুক্তজীবের প্রতি সফল হবে, তাহলে আমার একজনকে খোঁজ করে বার করতে হবে যে এই ভাগবতম্ পরিবেশন করতে পরবে।" তখন

ব্যাসদেবের হঠাৎ করে তাঁর সন্তান শুকদেবের কথা মনে পড়ল। "হ্যাঁ ! শুধু একজন কুশলী ব্যক্তি এই কেবলা ভক্তি জড়-জগতে বিস্তার করতে পারবে, আর সেই কুশলী ব্যক্তি হচ্ছে শুকদেব গোস্বামী। ও খুব উঁচু পরম স্তরে আবস্থান করছে।"

যখন শুকদেব তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তিনি ১২ বছর ধরে বেরিয়ে যাচ্ছেন না। তিনি সিদ্ধমহাপুরুষ এবং তাঁর সম্পূর্ণ বেদ-জ্ঞান ছিল। যখন সবাই দেখলেন যে, তিনি মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন না, সবাই চিন্তা করতে লাগলেন, ব্যাসদেবও চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর তিনি শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাতৃগর্ভ থেকে তুমি বেরিয়ে আসচ্ছো না কেন ? বেরিয়ে এসো !"

ছেলে উত্তরে বললেন, "না, যাব না ! আমি এখানেই থাকব। যদি আমি মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়া যাব, মায়া আমাকে আক্রমণ করবে।

আমি জানি যে, মায়া খুব শক্তিশালী—এই জড়-জগতের সমস্ত জীবকে আক্রমণ করতে তাঁর ক্ষমতা আছে।”

তখন ঋষিগণ এসে ব্যাসদেবকে বললেন, “তোমার মায়াকে থামিয়ে দিতে ক্ষমতা আছে, তাই তুমি মায়াকে পাঁচ মিনিট ধরে থামিয়ে দাও, তখন ছেলেটি বেরিয়ে যাবে।”

তাঁরা সবাই শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন আর শুকদেব মাতৃগর্ভ থেকে বললেন, “হ্যাঁ, ৫ মিনিটই যথেষ্ট। যদি তুমি মায়ার শক্তিকে ৫ মিনিটের জন্য থামাবে, আমি বেরিয়ে যাব।”

তখন ব্যাসদেব রাজি হয়ে বললেন, “ঠিক আছে, আমার এরকম শক্তি আছে, আমি সেটাই করব....” যখন ব্যাসদেব মায়ার কাজ থামিয়ে দিলেন, তখন শুকদেব তক্ষুনি মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেলেন !

সুতরাং, শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচনা করার সময় শুকদেবের কথা মনে করে ব্যাসদেব ভাবলেন,

“ওই ছেলে মায়ার আকৃষ্ট হয় না, ওর স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে বিরাজ করে। তাই এই ছেলে যদি শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রচার করবে, সবাই সেটা নিজের ধর্ম্মের মত স্বীকার করবে।” সেটা ভেবে ব্যাসদেব তাঁর ছেলেকে খুঁজতে শুরু করলেন, “কোথায় আমার ছেলে?” শুকদেব ওই সময় প্রায় ১৫ বছরের ছিলেন।

কিছু ক্ষণ পর বেদব্যাস শুকদেবকে খুঁজে পেলেন। তিনি ওঁকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, ওঁকে চিৎকার করে বললেন, “বাবা ! শুনো হে! আমাকে দেখো ! কৃপা কর আমার মুখ দেখো !” কিন্তু ছেলেটি বাবা-মাকে দেখেন না, মোটেই কিছু দেখেন না। ওর এই জড় জগতের প্রতি কোন স্বার্থ ছিল না আর শুধু তাও নয়। যখন শুকদেব সামনে হেঁটে যাচ্ছিলেন আর ব্যাসদেব ওঁর পিছনে ছুটে ছুটে যাচ্ছিলেন (শুকদেব একটি যুবক আর বেদব্যাস বুড়ো মানুষ ছিলেন—তিনি ছেলেটির সঙ্গে হাঁটতে

পারছিলেন না) , তখন রাস্তার মাঝে কয়েকজন মহিলা নদীতে স্নান করছিলেন। সেটা সব হিমালয়েতে ঘটে ছিল—ওখানে সব সময় বৃষ্টি পড়ছে, ইত্যাদি, লোকের পোশাক পড়ে স্নান করতে অসুবিধা হয়। তাই মহিলারা তাঁদের পোশাক এক দিকে রেখে দিলেন আর নদীতে উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করছিলেন। যখন তাঁরা শুকদেবকে দেখলেন, তখন তাঁরা কোন লজ্জা পেলেন না কারণ তাঁরা জানলেন যে, শুকদেবের আসলে চক্ষু নেই—তিনি কোন জড়-জগতের বস্তু দেখতে পান না। তথাপি তাঁর পিছনে ব্যাসদেবকে দেখলে মহিলাগুলো নিজেকে একবার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলেন। ব্যাসদেব এত বুড়ো মানুষ, তাঁর দাড়ি বোধহয় বারো ফুট ছিল, কিন্তু ওই ব্যাসদেবকে দেখে তাঁরা লজ্জা পেলেন। আবার শুকদেবকে (একজন যুবক) দেখলে, তাঁদের তাঁর সামনে কোন লজ্জা ছিল না। ওইরকম শুকদেব গোস্বামীর অবস্থা।

তাই, ব্যাসদেব শুকদেবকে খুঁজে বের করলেন, তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শুকদেবকে রাজি করাতে পারলেন না কারণ শুকদেব তাঁর কোন কথাই শুনলেন না। তখন ব্যাসদেব একটা কৌশল আবিষ্কার করলেন। তিনি কয়েকজন কাঠুরিয়া ছেলেকে খুঁজে পেলেন আর তাঁদেরকে শ্রীমদ্ভাগবতম্ থেকে কয়েকটি শ্লোক শিখালেন। যেমন :

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

"উত্তম-শ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রৌতপারম্পর্য্যে সাধিত হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন কৃষ্ণেতর-বিষয়-তৃষ্ণারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হয়। এই সঙ্কীর্ত্তন (মুমুক্ষুগণের) ভবরোগের

ঔষধস্বরূপ। ইহা (রুচিপর ভক্তের) হৃৎকর্ণ-রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বা এই হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হন।”

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০/১/৪)

ওই রকম তিন-চারটি শ্লোক তিনি ছেলেদেরকে শিখিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে আদেশ দিলেন, “যখন তোমরা শুকদেবকে দেখবে, তখন ওই শ্লোকগুলো আবৃত্তি করবে। এক বার ওর জগতের কথা অনুভব করতে হবে, ওই মুহূর্তে ওর সেটা শুনতে হবে। ওকে আমাকে খুঁজতে বলে দাও।”

ছেলেরা তাই করেছিলেন। যখন শুকদেব ওই শ্লোকগুলো তাঁদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন, তিনি একবার অবাক হয়ে পড়লেন, “আমি কখনও এমন মধুর ও আনন্দময় সেবা-প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতা লাভ করি নি !” তখন তিনি কাঠুরিয়া ছেলেদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

“তোমরা কোত্থেকে এই শ্লোক পেয়েছো ?”

ছেলেরা বললেন, “আমরা সেটা ব্যাসদেবের কাছ থেকে শিখেছি।”

“কোথায় উনি এখন ?”

“তিনি সরস্বতী নদীর তীরে বাস করছেন, বদরিকাশ্রমের কাছে।”

তক্ষুনি শুকদেব সেখানে গিয়েছিলেন। এসে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি তাঁকে বললেন, “আমি এক কাঠুরিয়ার কাছ থেকে এই শ্লোক শুনেছি। কৃপা করে আমাকে এই জ্ঞান দিন। আমার মনে হয় যে, সেটা পরম জ্ঞান, ব্রহ্মভূতের চেয়ে তা অধিক। আমার স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ভূমিকায় উপস্থিত হয়, আমার মনকে কিছু আকৃষ্ট করতে পারে না, কিন্তু এই শ্লোক আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে—যে শ্লোক আমি শুনেছি, সেটা আরও অনেক উন্নত এবং সুন্দর। এই জগতে এমন শক্তি আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান থেকে আরও বেশি আকৃষ্ট করতে

পারে—কৃপা করে ওই জ্ঞান আমাকে দিন !”

যা চেয়েছিলেন, সেটাই ব্যাসদেব পেয়েছিলেন—তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ওই ছেলেকে শিখাতে, তাই তিনি সমস্ত ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ পরম জ্ঞান শুকদেব গোস্বামীকে খুশি মনে প্রদান করেছিলেন। তারপর ব্যাসদেব অপেক্ষা করতে লাগলেন যখন সময় আসবে ওই শ্রীমদ্ভাগবতম্ সবাইকে বিস্তার করবার জন্য। তিনি জানলেন, “যদি এই শিক্ষা শুকদেবের দ্বারা বর্ণিত ও প্রকাশিত হবে, তখন সবাই সেটা স্বীকার করবে কারণ উনি উচ্চতম ভুমিকায় (উচ্চতম বৈরাগ্য বা ভক্তির অবস্থায়) বিরাজ করেন। সেইজন্য যদি ও এটা পরিবেশন করবে, তাহলে ইতস্তত না করে সবাই এই পরম ভক্তিযোগ স্বীকার করবেই।”

তখন, ওই দিনটা এসেছিল।

একটি ব্রাহ্মণ ছেলের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে পরীক্ষিত মহারাজকে সাত দিন পর মৃত্যুমুখে

পতিত হতে হবে। পরীক্ষিত মহারাজ বিরাট রাজা ছিলেন। তার ভগবানের প্রতি অনেক ভক্তি ছিল এবং তিনি সব সময় অনেক স্নেহ ও সম্মান করে, তাঁর পূর্ণশক্তি নিয়ে রাজ্যটাকে শাসন ও রক্ষা করতেন। যখন তিনি অভিশাপ পেয়েছিলেন, তিনি কি করে মৃত্যুর পর মুক্তি বা পরম মঙ্গল লাভ করতে পারেন, ওই সব উপদেশ দেওয়ার জন্য অনেক বিরাট ঋষি ও মুনিগণ তাঁর কাছে এসেছিল। সব ঋষিগণের উপদেশ শুনে পরীক্ষিত মহারাজ একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, "অনেক উপদেশক এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা সবাই নিজের সম্প্রদায়ের মহান পুরুষ, কিন্তু কার উপদেশ আমার মানতে হবে?"

এদিকে কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে শুকদেব গোস্বামী ওই পরীক্ষিত মহারাজের সভায় এসেছিলেন। শুকদেব গোস্বামীর প্রবৃত্তি ভীষণ অদ্ভুত ছিল—তিনি কাউকে বা কিছু দেখলেন না। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আত্মার নিয়ে

সন্তুষ্ট ছিলেন ("নিজলাভপূর্ণো")। তিনি পরীক্ষিত মহারাজের সভায় এসেছিলেন কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে, নিজের ইচ্ছা মত নয়। কি করে তিনি হাজির হলেন ওই সভায়? যে ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতমে বর্ণনা করেছিলেন, সেটা খুবই সুন্দর। শুকদেবের কোন পোশাক ছিল না, তিনি একবারে উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন ; তাঁর চেহারা পাগলের মত ছিল কিন্তু তিনি পাগলের মত ব্যবহার করলেন না—তিনি সব সময় পরমাত্মার চিন্তায় তন্ময় ছিলেন। যখন তিনি সভায় প্রবেশ করলেন, অনেক ওর মত যৌবন ছেলে তাঁর পিছনে এসেছিলেন—ওরা তাঁকে বাহিরে পাগলের মত দেখে অনেক কিছু দিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করলেন, তারা জানতেন না শুকদেব গোস্বামী কে। শুকদেব গোস্বামী কিছু মনে করলেন না—যেখানে কৃষ্ণে তাঁকে তুলে নিতেন, সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে যেতেন।

তাই যখন এই শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত

মহারাজের মহাসভায় প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত মহাপুরুষ, মহাঋষিগণ যে ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর মুখ ও চেহারা দেখলেন, তখন সবাই বুঝতে পেলেন, "এ নিশ্চয়ই ব্যাসদেবের পুত্র !" তাঁদের মধ্যে অনেকেই শুকদেবের জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন বলে তাঁরা তাঁকে চিনলেন, তা নাহলে তাঁর মুখ ও চেহারা দেখে তাঁরা বুঝতে পারলেন তিনি কে। তাই শুকদেব গোস্বামীকে দেখে ওরা বুঝতে পারলেন তিনি কে, তাঁরা সকলে তাঁকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা হচ্ছে যে, শুকদেব কাউকে সম্মান দিলেন না কারণ তাঁর কোন অনুভূতি ছিল না—কাকে তিনি দণ্ডবৎ করবেন? কিন্তু সেখানে তাঁর বাবা ছিলেন, তাঁর পিতামহ, তাঁর প্রপিতামহও ছিলেন, অনেক বিরাট ঋষি, মুনি ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন:

অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ শরদ্বা-
নরিষ্টনেমির্ভৃগুরঙ্গিরাশ্চ।

পরাশরো গাধিসুতোঽথ রাম
উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ ॥
মেধাতিথির্দেবল আষ্টিষেণো
ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ।
মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি-
র্দ্বৈ পায়নো ভগবান্ নারদশ্চ ॥

"বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে অনেক বিরাট ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন—অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্, অরষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিতনয়, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু। মেধাতিথি, দেবল আষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবয়, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ভগবান্ নারদ।"

(শ্রীমদ্ভাবগতম্, ১/১৯/৯-১০)

নারদ মুনিও সেখানে নিজে উপস্থিত ছিলেন, ব্যাসদেবও সেখানে ছিলেন, ব্যাসদেবের পিতা পরাশর ছিলেন (তিনি সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য পণ্ডিত ছিলেন)। আসলে সমস্ত উপস্থিত মহাপুরুষগণ

নিজের সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের মুখ্য পণ্ডিত ছিলেন—অত্রি ঋষি, বশিষ্ঠ ঋষি, চ্যবন ঋষি, শরদ্বান্ ঋষি, অরষ্টনেমি ঋষি, ভৃগু ঋষি, অঙ্গিরা ঋষি, ইত্যাদি। বহু মহান ঋষিগণ ওখানে ছিলেন যে তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ অবস্থান ধরেছিলেন—কারও পাঁচ ফুট দাড়ি ছিল, কারও ছয় ফুট দাড়ি ছিল, কারও আট বা দশ ফুট দাড়ি ছিল, ইত্যাদি। সবাই ওই সভাতে বসে ছিলেন, হঠাৎ করে শুকদেব, একটি ১৬ বছর বয়সের যুবক, উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করলেন—তাঁর চোক্ষের কোন অনুভূতি ছিল না, তিনি জড়-জগতের মধ্যে কিছু দেখতে পারলেন না।

তখন, শুকদেব গোদ্বামীকে দেখে সবাই পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন, "হে মহারাজ, আপনি এত ভাগ্যবান যে, এই ছেলে এখানে এসেছে ! ও ব্যাসদেবের ছেলে। ও যা বলবে, সেটা সবার কাছে শেষ কথা—সেটা দিয়ে আপনার এই জীবনেও মঙ্গল হবে আবার তারপর

যে কোন জন্মে মঙ্গল হবে। আমরাও খুব খুশি হব যদি ও আপনার জন্য কিছু বলবে। যে সিদ্ধান্ত ও বলবে, আমরা সবাই সেটা মেনে নেব।”

তখন পরীক্ষিত মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে আসন দিলেন আর শুকদেব গোস্বামী কাউকে সম্মান না জানিয়ে তার উপরে স্বচ্ছন্দে বসলেন । তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না—তাঁর সামনে শুধু মাত্র পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন। পরে তিনি দেখতে পেলেন যে, ওখানে অনেক ঋষিগণ সমবেত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানলেন না, ওঁরা সব কে। পরীক্ষিত মহারাজ একবার শুকদেব গোস্বামীকে পূজা করলেন আর শেষ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার মঙ্গল কি করে হবে, কৃপা করে বলুন। আমার শুধু মাত্র সাত দিন আয়ু আছে, যে কোন মুহূর্তে আমাকে মরে যেতে হবে, কিন্তু আমি জানি না, আমার জীবন কিসে ভাল হয়। সবাই আপনাকে সম্মান দেন, আপনি কৃপা করে আমাকে পরম সাধ্যবস্তুর সম্বন্ধে উপদেশ দিন।”

পরীক্ষিত মহারাজের জিজ্ঞাসা শুনলে শুকদেব গোস্বামী বললেন, "আপনি ভাল অন্বেষী—আপনার প্রশ্ন শুনে আমি খুশি হলাম। আসলে এই জগতে শুধু মাত্র একটা প্রশ্ন আছে ওই প্রশ্নটা সবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। বহু প্রশ্ন করতে দরকার নেই। প্রশ্নের উত্তরও এক মাত্র আছে, বহু উত্তর দিতেও দরকার নেই।" আমরা এই জড়-জগতে দেখতে পাই যে, লোকের অনেক প্রশ্ন আছে— লোক হাজার হাজার প্রশ্ন করে কিন্তু যারা এই মায়িক জগতের সঙ্গে প্রলিপ্ত থাকে, তারা হাজার হাজার প্রশ্ন করবে।

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥

"হে রাজশ্রেষ্ঠ! গৃহেতে আসক্তচিত্ত, গৃহগত পঞ্চস্নূনাপর এবং 'আমরা কে? কি বা করিতেছি, ভবিষ্যতে আমাদের কি হইবে এবং কি প্রকারেই বা নিস্তার লাভ করিব' ইত্যাদি

আত্মতত্ত্ব জ্ঞানালোচনায় উদাসীন ব্যক্তিদিগের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে।”

(শ্রীমদ্ভাবগতম্, ২/১/২)

যাঁরা নিজেকে দেখেন নি, তাঁরা হাজার হাজার প্রশ্ন করেন—ওই রকম লোকের মনে বহু প্রশ্ন উদয় হয়। “আমি কি করে টাকাপয়সা অর্জন করব? আমি সংসার কি করে চালাব? আমার সন্তানের কি করে মঙ্গল হবে?” ইত্যাদি। অনেক প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন এই জড় জগতের প্রতি। কিন্তু “আমি কি করে যত দ্রুত সম্ভব এই জড়-জগৎ থেকে আমার প্রকৃত বড়িতে আসতে পারি?”—যাঁরা নিজের আত্ম-স্বরূপ বুঝতে পারেন, তাঁদের কাছে সেটা হচ্ছে একটিই মাত্র প্রশ্ন। বাড়ির গতি কী, সেটার বদ্ধজীবের কোন অনুভূতি থাকে না বলে তাঁদের এই প্রশ্ন করতে হবে, “আমার বাড়িতে গতি কী? এটা আমার বাড়ি নয়, এটা আমার সম্পত্তি নয়। আমি এখানে

বিদেশী, কিন্তু আমার বাড়ি কোথায় ? আমি জানি না কোথায় সেটা জায়গা বা কোন রাস্তা দিয়ে ওই জায়গা পৌঁছে যাওয়া হয়।”

তারপর শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি পরম কৃষ্ণভক্তির প্রবৃত্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। কিছু পরে বেদব্যাস ওই সব বর্ণনা সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের নামই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতম্। আসলে শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছিল যখন শ্রীমদ্ভাগবতমের কথা চতুর্থ বার বলা হয়েছিল। প্রথম বার নারদ মুনি বেদব্যাসের কাছে মন্ত্রম্ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার বেদব্যাস ভগবৎজ্ঞান শুকদেব গোস্বামীকে দিয়েছিলেন। তৃতীয় বার শুকদেব গোস্বামী ওই ভগবৎজ্ঞান পরীক্ষিত মহারাজকে দিয়েছিলেন। আর চতুর্থ বার নৈমিষারণ্যে ছিল। ওই সময় একটি শ্রুতিধর শ্রীসূত গোস্বামীর নামে ছিলেন, তিনিও পরীক্ষিত মহারাজের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রুতিধর মানে তিনি যা একবার শুনলেন সেটা মনে রাখতে পারেন। তাই যখন শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের সঙ্গে আলাপ করলেন, ওই শ্রীসূত গোস্বামী তখন উপস্থিত হয়ে সব কিছু মনে রাখলেন। পরে ষাট হাজার ঋষি নৈমিষারণ্যে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। যখন শ্রীসূত গোস্বামী সেখানে এসেছিলেন, তখন সমস্ত ঋষিগণ তাঁকে অনুরোধ করলেন, "আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছে—এখন যে জ্ঞান শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে দিয়েছিলেন, কৃপা করে সেই জ্ঞানটা আমাদেরকে শিখান। আপনি ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাই আপনি সব কিছু জানেন।" তখন শ্রীসূত গোস্বামী আবার সব কিছু বর্ণনা করেছিলেন। ওই সময় বেদব্যাস ওখানে ছিলেন না কিন্তু তাঁর যোগসিদ্ধির দ্বারা তিনি ওই সভা দেখতে পারলেন এবং শ্রীসূত গোস্বামীর কথা শুনতে পেরে তিনি সমস্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ

করেছিলেন এবং এই পরম ভক্তিযোগের জ্ঞান গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেছিলেন। ওই গ্রন্থের নাম হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতম্।

গ্রন্থ শেষ করলে বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতমের বর্ণনা দিয়ে বললেন, "এই গ্রন্থের মধ্যে আমি যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করছি, সেটা হচ্ছে সমস্ত মুক্তজীবের পরম সাধ্যবস্তু।"

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যাবিমুচ্যেন্নরঃ॥

"শ্রীমদ্ভাগবতসংজ্ঞক বিশুদ্ধ পুরাণ বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয়বস্তু, ইহাতে পরমহংস পুরুষগণলভ্য এক অমল পরম জ্ঞান কীর্ত্তিত এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-সমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। মানব ভক্তি-সহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১২/১৩/১৮)

তার আগে আর একটি বিশেষ শ্লোক আছে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের সার বর্ণিত হয় :

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

"হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, ত্বক অষ্টিপ্রভৃতি কঠিন হেয়াংশরহিত তরল পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন। পরমমুক্ত পুরুষগণও স্বর্গাদি-সুখের ন্যায় ইহাকে উপেক্ষ না করিয়া নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১/১/৩)

"হে অমৃতস্য পুত্র ! অমৃত-সমুদ্রের সন্তান !

এই যে বিষয়ীর ক্রমবিকাশের কথা, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত ভক্তির কথা, যে গোলোকধাম থেকে নারদ গোস্বামীর কাছে এসেছে, নারদ গোস্বামীর কাছ থেকে আমার কাছে এসেছে এবং এখন আপনাদের মঙ্গলের জন্য এই জড় জগতে শুকদেব গোস্বামী মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই কথা আপনারা দয়া করে শুনুন। যখন শুকদেব গোস্বামী নিজে সেটা পরিবেশন করেছেন, সেটা আরও বেশি মধুর হয়। নিয়ে নিন ! সুখী হন, কৃষ্ণপ্রেম পেয়ে আপনাদের চিৎস্বরূপের ধন পান !" বেদব্যাস ওই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা দিয়েছেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতমের সৌন্দর্য্য এই ভাবে বর্ণনা করছেন, "যখন মুক্তপুরুষগণ (যাঁদের জড় জগতের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না) সেটা সাধন করেন, তাঁরা পরমানন্দ, উল্লস, ভাব, আসক্তি ও কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। সেটা হচ্ছে প্রকৃত সাধক-জীবনের

ফল।” এই বর্ণনা বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতমের শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

আমি এখানে এই শ্লোকটাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না, কিন্তু আমি এই শ্লোকটা আপনাদেরকে শুনাব। যদিও আপনারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, কিন্তু এই শ্লোকটাকে শুধু মাত্র শুনলে আপনাদের ভাল লাগবে :

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যাবিমুচ্যেন্নরঃ ॥

“শ্রীমদ্ভাগবতসংজ্ঞক বিশুদ্ধ পুরাণ বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয়বস্তু, ইহাতে পরমহংস পুরুষগণলভ্য এক অমল পরম জ্ঞান কীর্ত্তিত এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-সমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। মানব ভক্তি-সহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।”

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১২/১৩/১৮)

"সেটা শুনলে, পড়লে, উপলব্ধি করলে, আপনারা চিন্ময় ধামের পরমানন্দ পাবেন।" সেটা হচ্ছে বেদব্যাসের কথা—"পরমানন্দ।"

সেইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতম্ এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছে, আর এই জ্ঞান হচ্ছে সকলের জীবনের মূল উদ্দেস্য, শুধু মুক্তজীবের নয়।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

"ব্রহ্মানন্দ সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিতবিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধানরহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন, কেননা ভগবান্ শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১/৭/১০)

ভগবানের লীলা এই করম—তিনি সমস্ত মায়াবদ্ধজীব ও মুক্তপুরুষগণকে অকর্ষণ করেন। তিনি তাঁর বাঁশি-গানের দ্বারা সমস্ত জীবগণকে

অকর্ষণ করেন। সেটাই হচ্ছে "গায়ত্রী মুরলীষ্ট-কীর্ত্তন-ধনং রাধাপদং ধীমহি"—যা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শ্রীমতী রাধারাণীর কীর্ত্তন ছাড়া আর কোন সুর করছেন না, সেটা হচ্ছে গায়ত্রীর সার ও প্রকৃত অর্থ।" এই শ্রীলগুরুমহারাজের (শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের) কথা খুব সুন্দর। কার পূজা আমরা করব—শক্তি বা শক্তিমানের? কৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমান আর রাধারাণী হচ্ছেন শক্তি। কার পূজা আমরা করব আর কার আশ্রয়ে আমরা সেটা করব? সেটা হচ্ছে আমাদের শ্রীলগুরুমহারাজের উপলব্ধি বা সাধনা, আবার সেটা হচ্ছে পরম সাধনা যে শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বেদান্ত-দর্শন, উপনিষদগুলো ইত্যাদির দ্বারা অবলম্বন করা হয়। আমরা দেখতে পাই যে, এই জ্ঞান সমস্ত গ্রন্থ দিয়ে অবলম্বন করা হয়।

সুতরাং, যখন শ্রীমদ্ভাগবতম্ এই জড় জগতে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সমস্ত শাস্ত্রীয়-জগৎ

শ্রীমদ্ভাগবতমের গুণ কীর্ত্তন করতে করতে নৃত্য শুরু করলেন কারণ তারা সবাই নতুন আলোক পেয়েছেন। কেন না? কারণ সবার কাছে কিছু বৈশিষ্ট্য বা সম্পত্তি আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতমের আগে সব কিছু হত্যাকাণ্ড ভাবে ছিল। যখন শ্রীমদ্ভাগবতম্ অবতীর্ণ হয়ছিল, তখন সবাই নিজের নিজের স্থান পেয়েছেন এবং স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলেন, "হ্যাঁ, সেটাই আমার আছে।" তার আগে তারা বিশেষ ভাবে কিছু জানলেন না, তারা নিজের স্থানের কথা অনেক জায়গায় শুনেছিলেন, "হ্যাঁ, সেটা উচ্চতম, সেটা নিচুতম, সেটা মধ্যে থাকে, ইত্যাদি," কিন্তু তারা অবধারণ করতে পারলেন না, তাঁদের স্থান কী এবং তাঁদের সম্পত্তি কত আছে। তাই যখন শ্রীমদ্ভাগবতম্ এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন সমস্ত শাস্ত্রীয়-জগৎ বুঝতে পারলেন, "আমার নিয়তি এই ভূমিকা পর্য্যন্ত, আমার সীমান্ত এখানেই আছে।" তার আগে সেটা বিশৃঙ্খল ভাবে থাকত।

সেইজন্য নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে বকা-ঝকা করে বললেন, "তুমি ত শাস্ত্রনিপুণ, বিশেষজ্ঞ, আর তুমি এসব এ ভাবে প্রকাশ করেছো ?! সেটা কী ?! তোমার এখন সব কিছু পরিবর্তন করতে হবে, তা নাহলে সবাই তোমারই দোষ দেবে !"

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥

"স্বভাবতঃ নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদিতে রক্ত অর্থাৎ অনুরাগী বা আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মের জন্য আপনি যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির বিধি দিয়াছেন তাহাতে আপনার মহা অন্যায় হইয়াছে কেননা আপনার বাক্যে উহাই মুখ্যধর্ম্ম এই স্থির করিয়া প্রাকৃত লোক অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক তদনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা মানে না, বা নিজে বুঝে না।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১/৫/১৫)

নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে কড়াভাবে বকাঝকা করলেন। তিনি "জুগুপ্সিতং" কথা বলেছেন। জুগুপ্সিতং মানে যে খাদ্যের কোন মূল্যও নেই, কোন স্বাদও নেই, সেইরকম খাদ্য তিনি দিয়েছিলেন। "তুমি সেই রকম খাদ্য সকলের জন্য পরিবেশন করেছো—যে খাদ্যের মূল্যও নেই, কোন স্বাদও নেই ! তোমার রান্না ঠিক করো ! ভাল, ঐশ্বর্যযুক্ত প্রসাদ পরিবেশন করো—সেটা সুস্বাদযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হতে হবে ! কিন্তু তুমি যা দিয়েছো, সেটা ওরা চায় না। লোকের ক্ষিধা পেয়েছে আর তুমি ওদের এক গ্লাস জল দিয়েছো। সেটা কী ?! কিছু খেতে দাও, আর যা দিচ্ছো, সেটা ঠিকমত খাদ্য হতে হবে, ওদের পেটের জন্য। যদি তুমি শুধু মাত্র জল দেবে, তাহলে তাদের পেট খারাপ হয়ে যাবে !"

(যদি কেউ খুব ক্ষিধা পেয়ে শুধু জল খায়, তাহলে দেহের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়,

কিছু এনজাইম মরে যায় আর যা কিছু খায়, সব জলের মত হয়। আর একটা রোগ হচ্ছে কোষ্ঠবদ্ধতা—তৃষ্ণা পেয়ে শুধু খাদ্য খেয়ে তাহলে এই অভ্যাস পেয়ে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়ে যাবে। আমি সেটা আয়ুর্বেদ গ্রন্থে পড়েছি।)

তাই নারদ গোস্বামী বললেন, "যা করেছো, সেটা খুব ঘৃণার্থ করেছো ! সেটা যে অন্যায় করেছো, আমি বলছি কেন? কারণ সবাই তোমার প্রতি বিশ্বার করে, সবাই বিশ্বাস করে যে, তুমি যা দেবে, সেটা সবার মঙ্গলের জন্য দেবে। তাই যখন তুমি কিছু দিয়েছোই, সবাই তা বিশ্বাস করেছে। এই জগতে তোমার এইরকম খ্যাতি। যদি তুমি নিজে সেটা ঠিক করবে না, তাহলে সেটা কে ঠিক করবে? তোমার ছাড়া ওরা কাউকে বিশ্বাস করবে না। তুমি যদি তোমার নিজের কার্য ঠিক করে দেবে, তাহলে ওরা তোমার কথার প্রতি বিশ্বাস করবে।" বারো শ্লোকের মধ্যে নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে

বকাঝকা করলেন, সেটাও শ্রীমদ্ভাগবতমের মধ্যে, প্রথম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়।

তার পর বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রকাশ করলেন। সেখানে তিনি লিখেছেন :

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

"যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা শ্রবণাদিলক্ষণা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১/২/৬)

সেটা হচ্ছে বেদব্যাসে শেষ সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে পরম ধর্ম্ম এবং এই ভক্তি অহীতুকী ও অপ্রতিহতা। ওই রকম কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে সকলের কাছে পরম সাধ্য এবং এই প্রকার ভক্তির জ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতমে বিস্তার করা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ শুধু মাত্র বহু কৃষ্ণলীলা প্রকাশ

করেন না—তিনি ওই লীলাগুলোর ব্যাখ্যাও করেন। আর তার মধ্যে সবার প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবধানতার কথা আছে :

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

"ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগকাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হ'ন।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০/৩৩/৩৯)

ওই লীলাগুলো শুধু মাত্র ভগবানের পরিতৃপ্তি বিধান করার জন্যই এবং ভগবানের প্রতি ভক্তির দ্বারা করা হয়।

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।

যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ

"প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন : বিশেষতঃ, নিজলাভে পূর্ণ দয়ালু এই প্রভু কৃপা-প্রকাশে অবিদ্বান্দিগের পূজা নিজের জন্য গ্রহণ করেন না। লোককৃতা ভগবৎসম্মানাদি নিজমুখশ্রী-প্রতিবিম্বের শোভার ন্যায় আপনার জন্যই হইয়া থাকে।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৭/৯/১১)

শ্রীমদ্ভাগবতমের কথা ব্যাখ্যা করে বেদব্যাস বললেন, "যেমন ললাটে তিলক করলে আয়নায় তিলকটাকে দেখতে পাবেন এবং ললাটে তিলক না করলে আয়নায় তিলকটাকে দেখবেন না— তেমন কৃষ্ণলীলার কথা শ্রবণ করলে সমস্ত জড় আসক্তি বা অস্তিত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং যেখানে থাকুন না কেন (এই জড় জগতে বা চিনময় ধামে) সবাই শুদ্ধ ভক্তির জীবন সাধন করতে সম্ভব হয়, কিন্তু সাধু সাবধান—

কৃষ্ণলীলার কখনও অনুকরণ করবেন না।” এই রকম সাবধানতার কথা এখানে রয়েছে :

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

“ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ-বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হ’ন, মূঢ়তা প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।”

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০/৩৩/৩০)

যে লীলা কৃষ্ণ করছেন, সেই লীলা কখনও করতে চেষ্টা করবেন না। তাঁকে অনুকরণ করবেন না। যে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে উঠিয়ে দিতে পারেন, সে রাসলীলা করতে পারেন কিন্তু আপনারা এক টন পাথরও হাতে ধারণ করতে পারেন না তাই কৃষ্ণ যা করেছেন সেটা আপনারা কি করে করবেন? তাঁকে অনুকরণ করবেন না।

শিবজী মহারাজ বিষ পান করে মারা গেলেন না—বরং তিনি উন্নত স্থান ও 'নীলকণ্ঠ' নাম পেয়েছেন কারণ ওই বিষ তাঁর কণ্ঠে ভূষণের মত বিরাজ করে। কিন্তু যদি আপনারা কোবরার বিষ খাবেন, তাহলে আপনারা একবারে মরে যাবেন। অধিকারনুসারে খেতে হয়। যে খাদ্য আপনাদের পেট ও হজম ক্ষমতার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে, সেটাই খান। আপনারা বদ্ধ বহিরমুখ জীব—যে বৈরাগীগণ বা মুক্তগণ হজম করতে পারেন, সেটা আপনাদের কাছে সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করবেন না—আপনাদের কৃষ্ণলীলার পূজা করতে হবে, তাহলে যে ধামে সব কিছু মঙ্গলময়, সব কিছু পরমানন্দকারী ও সুখকারী, এক দিন সেই প্রকৃত ধামে প্রবেশ করতে আপনারাও সুযোগ পাবেন।

— ☸ —

কাঙ্গালী ভোজন কবে হ’বে ?

(ভগবান ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের শ্রীহরিকথা)

শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বাৎসরিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। নানাদেশ হইতে অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক, স্বয়মাদর্শ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সকলেই সগণ প্রত্যাগমন করিতেছেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রসন্তান ও ভদ্রমহিলাগণও ভগবদ্-ভক্তি-রস-পিপাসা লইয়া আশ্রমে আগমন করিতেছেন। নিঃস্বার্থ, সেবাপরায়ণ সেবকমণ্ডলী, সকলেই অনাবিল আনন্দে, অকপট সেবাবৃত্তিতে, অবিরাম পরিশ্রমে,—আহূত, অনাহূত, ভক্ত, অভক্ত, বিষয়ী ও বিরক্ত—সেবোন্মুখ, সকলকেই হরিকীর্ত্তনদ্বারা সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ-কথায়, কৃষ্ণগুণ-গাথায় ও নাম-সংকীর্ত্তনে সকল হৃদয়ের আনন্দ-উৎস উছলিয়া উঠিতেছে ! বিস্ময়া-বিষ্ট পথিকও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া, গন্তব্য ভুলিয়া স্তব্ধ হইতেছেন।

এমন সময় সহসা কে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলি, হাঁ গা, মঠে কাঙ্গালী ভোজন কবে হ'বে?" উত্তর দিব কি ! অহো, এই প্রশ্নেই, আমি অপর ভাবে আপনাকে যে হারাইয়া ফেলিলাম ! আপনার মনের দিকেই চাহিলাম। তাহারই সঙ্গে ইহার একটু বুঝা-পড়া আরম্ভ হইল।

বলি হাঁ রে অবোধ মন, সত্য বল্ দেখি,—তুই কিসের কাঙ্গাল ; কি তোর অভাব ; কি চা'স্? হায়, হায়,—তুই যে তোর এই জড় ইন্দ্রিয়গুলিকেই কেবল পরিতৃপ্ত কর্ত্তে চাস্ ; তাদের দুষ্ট ক্ষুধায় ইচ্ছামত ভোগ-সুখেরই অভাব অনুভব করিস্ ; আর, তাহা যথেষ্টরূপ

যোগাইতে না পারিয়া তাহারই তরে আপনাকে কাঙ্গাল ভাবিস্ ! সত্য নয় কি ? কবে কাঙ্গালী ভোজন হইবে ; কবে বিবিধ উপচারে, বিবিধ উপাদেয় উপাদানে রসনার সুখ-সাধন করিতে পারিব,—অন্বেষণ কেবল তাহারই ! সুপক্ক-সুফল-শোভিত সুন্দর রসাল-তরুমূলে আসিয়া, তোর অনুসন্ধান পড়িয়াছে পক্ক আম্ড়ার ! তুই তাহাই জানিস্ ; তাহারই রসে তোর রসনা মজিয়া আছে। তুই মনে করিতেছিস্,—তাহাতেই তোর তৃপ্তিলাভ হইবে ; রোগ-জনিত অরুচিটা কাটিবে ; খাইয়া মাখিয়া সুস্থ হইবি। কিন্তু, ভুল তোর এ'টা ; মহাভুল ! তুই ভাবিস্ না,—ঐ অপথ্য অম্লরসে তোর দাঁত আম্-লাইয়া যাইবে ; রোগ বাড়িবে ; আর কোনও উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ লইতে পারিবি না, মরিবি ! ভোগ-বাসনার বশে মহাপ্রসাদকে সামান্য রসনা-সুখ ভোজ্য-জ্ঞানে ভোজনের

ফলও তাহাই ! অবোধ মন, এখানে তোর কাঙ্গালী-বিদায়ের সন্ধান লওয়া বৃথা ! তুই যার কাঙাল, তাহা ত পথে ঘাটেও মিলে ; পশুতেও উপভোগ করে ; তার জন্য মঠে আসিতে হইবে কেন ? হাঁ রে,—কৃষ্ণৈক-শরণ মহাজন-সেবিত, মহাতীর্থ ঐ মঠের যে আহ্বান, ঐ মঠের যে নিমন্ত্রণ, তাহা কি তোর জড়ীয় রসে জড়-ইন্দ্রিয়-তর্পণ জন্য ? শিশুকে রোগনাশন ঔষধ সেবন করাইতে পুত্রবৎসলা কর্ম্মকুশলা মাতা লড্ডুকের লোভ দেখান্ ; তথায় কি সেই লড্ডুকই লক্ষ্য ? তা' নয় রে, তা' নয় ! মূল লক্ষ্য তাহার অন্তরালে অবস্থিত ! এখানেও, ঐ বিষ্ণুক্ষেত্রে, ঐ মহাতীর্থে, শ্রীগৌর-মুখামৃত-মধু মহাপ্রসাদ ভোজনের অভ্যন্তরেও, মহাপ্রভুর ভজনই সর্ব্বময় হইয়া বিরাজমান ! তাহাই অখিল জগতের মূল লক্ষ্য, মূল প্রয়োজন ! তাই বলি, আয় মন, আয়, যদি শ্রেয়ঃ লাভ

করিবি,—আয়,—ভোজনের কাঙ্গাল হইয়া নয়, ভজনের কাঙ্গাল হইয়া আয়, আর পরমপাবন ভাগবত-জনের চরণে লুঠিয়া মাথায় তুলিয়া নে,—

“ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥”

— ☸ —

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪ খণ্ডগুলো)
- শ্রীপুরীধাম মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
- শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত
- রচনামৃত

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্
- শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- প্রেমময় অন্বেষণ
- শ্রীশিক্ষাষ্টক
- শাশ্বত সুখনিকেতন
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- সুবর্ণ সোপান

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী :

- শরণাগতি
- কল্যাণকল্পতরু
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়

বিবিধ

- শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ভারতের প্রধান কেন্দ্রসমূহ

Web: scsmathinternational.com
Email: info@scsmathinternational.com

আন্তর্জাতিক কার্য্যালয়

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোড,
কোলেরগঞ্জ, পোষ্ট অফিস ঃ
নবদ্বীপ
জেলা - নদীয়া, পশ্চিবঙ্গ, ফোন :
৯৭৩২১১৩২৮৫

কলকাতা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন
সংঘ
৪৯১ দম দম পার্ক (বিপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৫,
পশ্চিমবঙ্গ

নৃসিংহপল্লী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৃসিংহপল্লী (দেবপল্লী),
সুবর্ণবিহার,
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং
৭৪১৩১৫
ফোন : ৯৭৩২১১৩২৮৫,
৯৬০৯৩০২৩১০

তারকেশ্বর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভঙ্গিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
ফোন : ৯৭৩২১১৩২৮৫,
৭৪৭৭৮৮১৯২৬

পুরী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌড় বাটসাহি
পুরী, পিন - ৭৫২০০১, ওড়িষ্যা,
ভারত
ফোন : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০

বর্ধমান

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
পোষ্ট এবং গ্রাম - হাপানিয়া
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
গ্রাম - বামুনপাড়া, পোষ্ট - খানপুর
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,

মুর্শিদাবাদ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফোন : ৮৪৮১০৩১৪১০

গোবর্দ্ধন

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
দশবিসা, পোষ্ট - গোবর্দ্ধন
জেলা - মথুরা, পিন - ২৮১৫০২
উত্তর প্রদেশ, ভারত
ফোন : ৮৬৩০৭৮৩০৬৩

বৃন্দাবন

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও মিশন
১১৩ সেবা কুঞ্জ, বৃন্দাবন, জেলা - মথুরা,
পিন - ২৮১১২১, উত্তর প্রদেশ, ভারত,
ফোন : ৭৮৭২২৯৬৩৯২

শিলিগুড়ি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫, নেতাজী সরনি, শিলিগুড়ি,
পিন - ৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গ,
ভারত
ফোন : ৯৭৪৮৯০৬৯০৭

একচক্রা ধাম

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম),
বীরচন্দ্রপুর, জেলা - বীরভূম,
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ৯৬০৯৩০২৩১০

নিউ দিল্লি

শ্রীলা শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তি যোগা
কালচারাল সেন্টার, ফ্ল্যাট - ৬
(টপ ফ্লোর), হাউস ২৩৯৪,
তিলক স্ট্রীট, (ইম্পেরিয়াল
সিনেমার পিছনে), চৌনা মাণ্ডি,
পাহারগঞ্জ, নিউ দিল্লি
মোবাইল : ৮৫৮৭৯০৮৭৪৪

গঙ্গা-সাগর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চকফুলডুবি, পোঃ - সাগর,
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা,
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

মহিলা আশ্রম কালনায়

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ
কালচারাল সেন্টার
গ্রাম - শাশপুর, পোঃ - কালনা,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

বেতুড়

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
বেতুড়, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন :
৯৯৩৩১৪৬০৯৬

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্ত পারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥

"আমি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইব।"

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥

"এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের হরিকথাহীন বৃথা আয়ু হরণ করিতেছেন ; কেবল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহার কাল যাপিত হয়, তাঁহারই আয়ু তিনি হরণ করেন না।"